মুহূর্তের মহাসঙ্গ: সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মহাসঙ্গ লাভ আমার কয়েক মুহূর্তের না, কয়েক বছরের। ঠিক মতো বলতে গেলে কয়েক দশকের। শুরু সেই ১৯৬৬-তে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলাতক ছাত্রবয়সে, ন্যাশনাল লাইব্রেরির সিঁড়িতে, তিনি নেমে আসছেন, আমি উঠছি। মুখোমুখি দেখা হতেই, 'কবিতা-পরিচয়'-এর তৃতীয় সংখ্যায় তাঁর 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতা নিয়ে শঙ্খ ঘোষ আলোচনা করেছিলেন, সদ্য প্রকাশিত সেই সংখ্যাটি তাঁর হাতে দিতেই তিনি তাঁর মার্জিত কিন্তু রাগত স্বরে বললেন, আমাকে দেখে তবেই তোমার পত্রিকা দেবার কথা মনে হল, অথচ বুদ্ধদেব বসুকে তাঁর বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসো!

বুদ্ধদেব বসুকে দিয়ে জীবনানন্দের যে-কোনও একটি কবিতা নিয়ে লেখাবার মতলবে কিছু দিন আগে থেকেই তাঁকে ভজাবার চেষ্টা করে যাচ্ছি, সেই আবদার আরও জোরালো করতে 'কবিতা-পরিচয়' নতুন সংখ্যা বেরনো মাত্র তাঁর বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসি। আরও একটা আকর্ষণ, তাঁর কথা বলার নিজস্ব শৈলী ও বিষয়বিস্তার লোহাকে চুম্বকের মতো আমাকে টেনে রাখত। শেষ অব্দি বুদ্ধদেব বাছলেন সুধীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' কবিতাটি। ক'দিন পর আমার হাতে সেই উষ্ণ আশ্চর্য পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো তুলে দিয়ে বললেন, 'জীবনানন্দের কোনও একটা কবিতা নিয়ে লেখার তাগিদ বোধ করলাম না। বরং এটাই মনে হয় এখন বেশি জরুরি!' উত্তেজিত রোমাঞ্চিত আমি রুদ্ধশ্বাসে তাঁর স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপিতে, সংস্কার ও সংশোধনের সহজবোধ্য নির্দেশগুলির ওপর চোখ বোলাচ্ছি দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'তোমার জন্য আমার আটটা দিন নষ্ট হল। এখন তো আমার শারদীয়া সংখ্যার লেখার চাপ। তুমি তো লেখার জন্য লেখককে দক্ষিণাও দাও না।'

সেদিনই সন্ধেবেলা কফিহাউসে আমার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হুবহু শুনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলে উঠলেন, 'কবিতা-পরিচয়ে লেখার জন্য কাউকে টাকা দেবেন না। যদি কখনও ছাপার খরচ, কাগজ কেনার খরচ, বাস ভাড়া-টাড়া বিক্রির টাকায় উঠেও যায়, তখনও দেবেন না। এই ধরনের পত্রিকার নীতি হিসেবেই দেবেন না।'

এ সব আলাদা প্রসঙ্গ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ন্যাশনাল লাইব্রেরির সিঁড়িতে প্রথম সাক্ষাৎ হলেও, তাঁকে ও বুদ্ধদেব বসুকে দূর থেকে প্রথম দেখি, আমার স্কুলের দিনগুলির ফাঁকে, ১৯৫৮য় মহাজাতি সদনে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে, অভ্যর্থনা সমিতির একমাত্র কিশোর সদস্য হবার সুযোগে। তাঁদের লেখা ছাড়াও ছবি দেখে ততদিনে দুজনের মুখও আমার চেনা হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুকে বলতে শুনলাম ও

দেখলাম, 'কী সুভাষ, কেমন আছো? এখন তো তোমাকে এর বেশি আর কিছু জিজ্ঞেস করাও চলে না। একই সঙ্গে সক্রিয় কমিউনিস্ট ও সার্থক কবি হয় কি না ভেবে দেখো।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা কয়েক দশক জুড়ে। সেইসব দীর্ঘ মহাসঙ্গ লাভের দু-একটি মুহূর্তের কথাই বলব এখানে।

একদিন তাঁর দুটি বই তাঁর হাতে দিয়ে কবিতা পড়বার অনুরোধ জানালাম। পর পর পড়ে শোনালেন অনেকগুলো কবিতা।

ও মেঘ
ও হাওয়া
ও রোদ
ও ছায়া
যাচ্ছি
ও নদী, ও মাঝি
বনের জোনাকি
ও নীড়, ও পাখি
যাচ্ছি

তাঁর গলার স্বর জড়ানো এই কথাগুলো এখনও শুনতে পাই।

একবার লখনউয়ে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সভাপতি, সেই মহীরুহের পাশে বটচারাসম আমি ছিলাম শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি। সুভাষদা মুম্বইয়ে একটা সাহিত্য-সভা সেরে দু'দিন আগেই পৌঁছেছিলেন লখনউয়ে। সম্মেলনের আগের দিন আমি এসেছি, উঠেছি একটা হোটেলে শুনে তিনি উদ্যোক্তাদের কাছে জোরাজুরি করেই নাকি তাঁদের সঙ্গে হোটেলে সোজা আমার ঘরে। শুরু হল সে এক দিগন্তবিস্তৃত আড্ডা। ঘরে তাঁর প্রিয় রাম আনানো হল। পাহাড়ি সান্যালের আতিথ্যপরায়ণ ভ্রাতুষ্পুত্র রাসু সান্যালের বদান্যতায় লখনউয়ের আমার আগের জানা, শতবর্ষ-প্রাচীন বড়েমিক্রার ছোট্ট দোকান থেকে শামি কাবাব এসে গেল। সুভাষদা মনের সব ক'টা কপাট খুলে যেন কথা বলছেন। গীতাদির সঙ্গে তাঁর বিয়ের মাত্র কয়েক দিন পর গলা তুলে 'গীতা, গীতা' বলে ঢুকলেন এসে ধ্রুব মিত্র। ''গীতা আমি দুজনেই বিরক্ত। ঘরে গুছিয়ে বসে ধ্রুব কী বলল জানো? বলল, 'গীতাতে ছিলাম, তারপর সুচিত্রায়। আবার গীতায় ফিরে এলাম।' আসলে ধ্রুবর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর নামও গীতা।''

ঘরে কথার বাঁধ ভেঙেছে।

'দেখবে অনেকেই এখন সঙ্গের জায়গায় সাথে লিখছে। জানালা দরোজা না লিখে জানলা দরজা লিখলেই তো হয়। দু'জন লোক না বলে দু'জন মানুষ বললে সেটা আর বাংলা থাকে না। বাংলা ভাষায় কত কী করা যায়, কত ভাবে কত দিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সেদিকগুলো কেউ ভাবে না। সরকারও না, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও না। খবরের কাগজও ঠিক সেভাবে এগিয়ে আসে না।' এইসব কথার মধ্যেই বার-কতক বললেন, 'তুমি যাতে হাত দাও, তাতেই সোনা ফলে। তোমার 'কর্মক্ষেত্র' পড়ে আমিই

কাজে লেগে পড়বার উৎসাহ পাই। 'হীরু ডাকাত' তো মানুষের মুখের ভাষার মধ্যেও পদে পদে পদ্য আবিষ্কার। 'শাদা ঘোড়া'য় তোমার উৎসর্গে বাজিমাত! বইটা পড়েই বুঝেছি—' কী বুঝেছেন স্বহস্তে লেখা সহজ নয়।

কথা মতো রাত আটটায় রিসেপশন থেকে ফোন এল— রাসু সান্যাল জানালেন গাড়ি নিয়ে এসে গেছেন। ফোন ধরে আমি কিছু বলবার আগেই সুভাষদা বলে উঠলেন, 'রাসুকে বলো দশটায় আসতে। আর হোস্টেলে আমার যেন নো মিল করে দেয়।'

রাত দশটায় রিসেপশন থেকে রাসুবাবুর ফোন পেয়ে এবারও সুভাষদার নির্দেশে বলতে হল, রাত বারোটায় আসতে। সেদিন লখনউয়ে রাতের আকাশ আলোয় ভরে বাকি রাতটুকুর মতো সুভাষদার সঙ্গে বিচ্ছেদ যখন এলই, তখন রাত দেড়টা। পুরো সময়টা বিশদে বলতে বিশ পাতায়ও কুলোবে না হয়তো। লখনউয়ের বাকি ক'টা দিনের কথা লিখতে না জানি আরও ক'দিস্তে কাগজ লেগে যাবে!

'কর্মক্ষেত্র' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'কাজের বাংলা' নামে একটা নিয়মিত ফিচার লিখতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তারও একটা মর্মান্তিক নেপথ্যকথা আছে। সেটা বলতেই পারব না। বলবার চেষ্টা করলেও চোখে জল এসে যাবে। আজীবন অর্থকষ্টভোগী, অথচ আশুতোষ, এই পদাতিক কবির আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগের কত না রটনা কানে আসত। যাই হোক, 'কাজের বাংলা'-র লেখক-পরিচিতিতে তাঁর জ্ঞানপীঠ ও অকাদেমি পুরস্কারের সঙ্গে কংগ্রেস-আমল থেকে চলে আসা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়ার কথাও লিখেছিলাম। কিংবদন্তি কমিউনিস্ট কবি, পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর নিজস্ব কাব্যভাষার বাতাসেই চল্লিশের দশকের প্রধান কবি হয়ে ওঠা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বামফ্রন্ট আমলেও রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হবে না তা ছিল আমার ধারণার অতীত। সম্পাদকের সেই ভুল ভাঙাতেই একটি মাপা কথার চিঠি লিখেছিলেন 'কর্মক্ষেত্র'-প্রতিষ্ঠাতা ও সে-সময়ের সম্পাদক আমাকে:

সম্পাদক সমীপে,

হঠাৎ নজরে পড়ল লেখক-পরিচয়ে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির কথা। আমি কস্মিনকালে রাজ্য সরকারের কোনও ইনাম পাইনি। ওটা লেখা থাকলে লোকে আমাকে ধাপ্পাবাজ বলবে। তাছাড়া 'প্রবাদপ্রতিম' কথাটা যা-নয়-তাই হওয়ায় আমি সঙ্কোচ বোধ করছি। অযথা বিশেষণ প্রয়োগ ভালো নয়।

ভবদীয়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সেইসব সময়ে ও তারপর থেকে আজীবন তাঁর সঙ্গধন্য সন্ধ্যাগুলি আজ আমার জীবনের প্রিয় স্মৃতি, হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ।

গভীর ব্যক্তিগত অনেক কথাও বলতেন অকপটে। আমাদের বাড়ি থেকে উঠতে প্রায়ই মধ্যরাত পেরিয়ে যেত। মাঝে মাঝে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবার গাড়িতে জোর করে আমিও উঠেছি। বাড়ির সামনে নেমে আমার কাঁধে হাত রেখে তখনও তাঁর কথা ও কল্পনা শেষ হত না। সেও এক দুর্লভ স্মৃতি।

এক রবিবার সন্ধেয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় আসবেন কথা ছিল। এদিকে সেদিন সকাল থেকেই লিফট অচল। লিফট বার্ষিক দেখভালের চুক্তি যে সংস্থার সঙ্গে, বহু বারের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত যদি-বা তাদের ফোনে পাওয়া গেল, সোমবারের আগে মেকানিকদের নাকি পাওয়া যাবে না। আমাদের প্রতিবেশী এক ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক আমাদের প্রয়োজনের গুরুত্বের কথা শুনে নিজে হাত লাগিয়েও লিফট চালু করা গেল না।

অগত্যা গীতাদি (কবির স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়)-কে ফোনে সব কথা জানিয়ে খুবই দুঃখের সঙ্গে সেদিনের ব্যবস্থা বাতিল করতে হল।

'দাঁড়াও, তোমাদের বাড়ি যাওয়া একবার পাকা হলে সুভাষ তা কিছুতেই বাদ দেবে না। তোমার বাতিলের যুক্তি লিখে দেখাই ওকে, ও কী বলে জেনে জানাচ্ছি তোমাকে।' দু-তিন মিনিটেই গীতাদির ফোন: সুভাষ বলছে, কথা যখন হয়েছে তখন যাবেই।

এর পরও ওঁকে নিরস্ত করার জন্য গীতাদি আমার বিশদ পরিস্থিতি-ব্যাখ্যা কাগজে লিখে সুভাষদাকে দেখিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এর আগে অনেক বার এসেছেন, আমরা যে ছ'তলায় থাকি, সেটাও ভালোই জানেন।

কথামতো সন্ধে সাতটাতেই নীচে এসে গেছেন দেখে আমাদের সারথী ও দুজন দ্বার-রক্ষককে একটা চেয়ার দিয়ে নীচে পাঠালাম। সযত্নে সাবধানে ওঁকে ছ'তলায় নিয়ে আসবার কথা ওদের ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম।

ওপরে আসা মাত্র ব্যাকুল হয়ে ওঁর আর ওঁর বাহকদের কষ্টের কথা জিজ্ঞেস করায় পাল্কিবাহকেরা জানালেন, 'উনি তো চেয়ারে ওঠেনইনি'। মানে? 'পুরোটাই হেঁটে উঠেছেন'।

আমাদের কথোপকথন বধির কবির কানে যায়নি, শুধু পদাতিক কবি তাঁর সরল হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে বললেন, 'অন্যের কাঁধে একবারই চড়ব। তাও জীবন থাকতে নয়।' তারপর বসে বললেন, 'দাঁড়াও, হার্টের গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে নিই।'

সেবার রাত বারোটায় মেকানিক এসে নিমেষে লিফট চালু করেছিল।

অনিবার্যভাবে বেশ কিছুটা নিজের কথা এসে যাওয়ায় লজ্জিত। পাঠক নিজগুণে মার্জনা করবেন, এই অনুরোধ।

'কালের কষ্টিপাথর', গ্রীষ্ম সংকলন ১৪২৬